سورة الحشر

সূরা হাশর

মদীনায় অবতীর্ণ, ২৪ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①
هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ
الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ
فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ
يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ②
وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
عَذَابُ النَّارِ ③ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ
فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ④ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً
عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ⑤

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (২) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে প্রথমবার একত্র করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন।

তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৩) আল্লাহ্ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। (৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্রই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন।

যোগসূত্র ও শানে-নুযূলঃ পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিক ও ইহুদীদের বন্ধুত্বের নিন্দা করা হয়েছিল। এই সূরায় ইহুদীদের দুনিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীদের বৃত্তান্ত এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এক গোত্র ছিল বনূ নুযায়ের। তারাও শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসল-মান-ইহুদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এর জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইহুদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সেমতে তিনি বনূ নুযায়ের গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, পয়গম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললঃ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনি-ময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর তারা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তাঁর উপর ছেড়ে দেবে, যাতে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু রাখে আল্লাহ্ মারে কে? রসূলুল্লাহ্ (সা) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বলে পাঠা-লেনঃ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লংঘন করেছ। অতএব তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেওয়া হল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এ স্থানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। বনূ নুযায়ের মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বললঃ তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দেবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেবে না। রূহুল মা'আনীতে আছে এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে মালিক, মুয়ায়্যদ এবং রায়েস ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর সাথে শরীক ছিল। বনূ নুযায়ের তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সদর্পে বলে পাঠালঃ আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে বনূ নুযায়ের গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনূ নুযায়ের দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে

রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খর্জুর বৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল! রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোন অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবে না। এগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সেমতে বনূ নুযায়েরের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খায়বরে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহুদীর সাথে খায়বর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনদ্বয়ই 'প্রথম সমাবেশ ও দ্বিতীয় সমাবেশ' নামে অভিহিত।---(যাদুল মা'আদ)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (তাঁর মহত্ত্ব, শক্তি-সামর্থ্য ও প্রজ্ঞার এক প্রভাব এই যে, তিনিই কাফির কিতাবধারীদেরকে অর্থাৎ বনূ নুযায়েরকে) তাদের বসতবাড়ী থেকে প্রথমবার একত্র করে বহিষ্কার করেছেন। [যুহরী বলেনঃ তারা প্রথমবার এই বিপদে পতিত হয়েছিল, যা ছিল তাদের দুষ্কর্মের ফলশ্রুতি। এতে পুনরায় তাদের এই বিপদে পতিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। সেমতে হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে পুনরায় তাদেরকে আরবভূমি থেকে বহিষ্কার করেন। তাদের বাস্তুভিটা থেকে বহিষ্কার করা মুসলমানদের শক্তি ও প্রাধান্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল। মুসলমানগণ, তাদের সাজসরঞ্জাম ও জাঁকজমক দেখে] তোমরা ধারণা করতে পারনি যে, তারা (কখনও তাদের বাস্তুভিটা থেকে) বের হবে এবং (খোদ) তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ তারা তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গের কারণে নিশ্চিত ছিল। তাদের মনে কোন সময় অদৃশ্য প্রতিশোধের আশংকাও জাগত না। অতঃপর আল্লাহ্র শাস্তি তাদের উপর এমন জায়গা থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের হাতে বহিষ্কৃত হল, যাদের নিরস্ত্রতার প্রতি লক্ষ্য করলে এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না, এই নিরস্ত্র লোকেরা সশস্ত্রদের বিপক্ষে বিজয়ী হবে।) তাদের অন্তরে (আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের) ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। (এই ত্রাসের কারণে তারা বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল। তখন তাদের অবস্থা ছিল এই যে,) তারা তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। (অর্থাৎ কড়িকাঠ, তক্তা ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেরাও গৃহ ধ্বংস করছিল এবং মুসলমানরাও তাদের অন্তর ব্যথিত করার জন্য ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করছিল।) অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, (এ অবস্থা দেখে) শিক্ষা গ্রহণ কর। (আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি মাঝে মাঝে দুনিয়া-তেও শোচনীয় হয়ে থাকে)। আল্লাহ্ যদি তাদের ভাগ্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন তবে তাদেরকে দুনিয়াতেই (হত্যার) শাস্তি দিতেন (যেমন তাদের পরে বনী কোরায়যার

ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। দুনিয়াতে যদিও তারা শাস্তির কবল থেকে বেঁচে গেছে, কিন্তু) পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা (তাদের এই বিরুদ্ধাচরণ দ্বিবিধ প্রকারে হয়েছে। এক. চুক্তি ভঙ্গ করা, যে কারণে নির্বাসনদণ্ড হয়েছে এবং দুই. আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা। এটা পরকালীন আযাবের কারণ। ইহুদীরা বলেছিল ঃ বৃক্ষ কর্তন করা ও বৃক্ষে অগ্নি সংযোগ করা অসমর্থের শামিল। অনর্থ নিন্দনীয়। এ ছাড়া কিছুসংখ্যক মুসলমান মনে করেছিল যে, এসব বৃক্ষ ভবিষ্যতে মুসলমানদেরই হয়ে যাবে। কাজেই এগুলো কর্তন না করাই উত্তম। সেমতে তারা কর্তন করেনি। আবার কেউ কেউ ইহুদীদের অন্তর ব্যথিত করার উদ্দেশ্যে কর্তন করেছে। অতঃপর এসব বিষয়ের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। জওয়াবের সাথে উভয় কাজকে সঠিক বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ তোমরা যে কতক খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ (এমনিভাবে যে কিছু পুড়িয়ে দিয়েছে) এবং কতক না কেটে কাণ্ডের উপর দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছ, তা তো (অর্থাৎ উভয় কাজই) আল্লাহ্র আদেশ (-ও সন্তুষ্টি) অনুযায়ীই, তাতে তিনি কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করেন। (অর্থাৎ উভয় কাজের মধ্যে উপযোগিতা আছে। ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেও মুসলমানদের এক সাফল্য এবং কাফিরদেরকে বিক্ষুব্ধ করার ফায়দা আছে। কারণ, এগুলো মুসলমানরা ভোগ করবে। পক্ষান্তরে কর্তন করা ও পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে মুসলমানদের অপর সাফল্য অর্থাৎ তাদের প্রাধান্য প্রকাশ পাওয়া এবং কাফিরদেরকে বিক্ষুব্ধ করার ফায়দা আছে। অতএব উভয় কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হওয়ার কারণে এগুলোতে কোন দোষ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনূ নুযায়ের গোত্রের ইতিহাস ঃ সমগ্র সূরা হাশর ইহুদী বনূ নুযায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।---(ইবনে ইসহাক) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই সূরার নামই সূরা বনূ নুযায়ের বলতেন।---(ইবনে কাসীর) বনূ নুযায়ের হযরত হারূন (আ)-এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইহুদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তওরাতে খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সংবাদ, হুলিয়া ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লিখিত আছে। এই পরিবার শেষ নবী (সা)-র সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক তওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেষ নবী (সা)। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেষ নবী হযরত হারূন (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন বনী ইসরাইলের পরিবর্তে বনী ইসমাঈলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেষ নবী। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল,

কিন্তু এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চেনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বল ভিত্তি। ফলে ওহুদ যুদ্ধের প্রথমদিকে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টলটলায়মান হয়ে গেল। এরপরই তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল।

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্রসমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তি চুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। 'সীরত ইবনে হিশামে' এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনিভাবে বনূ নুযায়েরসহ ইহুদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনূ নুযায়েরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগবাগিচা ছিল।

ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যত এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দুরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনূ নুযায়েরের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশজন ইহুদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহুদ যুদ্ধ ফেরত কোরায়শী কাফিরদের সাথে সাক্ষাৎ করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশজন ইহুদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবূ সুফিয়ান চল্লিশজন কোরায়শী নেতাসহ কা'বা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুল্লাহ্র গিলাফ স্পর্শ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে।

চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং সাহাবী মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) তাকে হত্যা করেন।

এরপর বনূ নুযায়েরের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) অবহিত হতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি উপরে শানে-নুযূলে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা, যে গৃহের নীচে তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বসিয়েছিল তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারী পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওমর ইবনে জাহ্হাশ। আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

একটি শিক্ষা : আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী পর্যায়ে বনূ নুযায়েরের সবাই নির্বাসিত হয়ে মদীনা ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনাতেই

নিরাপদ জীবন যাপন করতে থাকে। তাদের একজন ছিল এই ওমর ইবনে জাহ্হাশ, দ্বিতীয় জন তার পিতৃব্য ইয়ামীন ইবনে আমর ইবনে কা'ব।---(ইবনে কাসীর)

আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনা ঃ শানে-নুযূলের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই হত্যাকাণ্ডের রক্ত বিনিময় সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ ব্যাপারেই বনূ নুযায়েরের চাঁদা আদায়ের জন্য তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর লিখেন ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের কাহিনী নাতিদীর্ঘ। তন্মধ্যে বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিদিত। একবার কিছুসংখ্যক মুনাফিক ও কাফির তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্তরজন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটা চক্রান্ত ছিল। কাফিররা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর ইবনে যমরী (রা) কোনরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এই মাত্র কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর উনসত্তর জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাফিরদের মুকাবিলায় তাঁর মনোবৃত্তি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তিনি দুইজন কাফিরের মুখোমুখি হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যা করে দেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শান্তি চুক্তি ছিল।

আজকালকার রাজনৈতিক চুক্তিসমূহে প্রথমেই চুক্তিভঙ্গের পথ খুঁজে নেওয়া হয়। কিন্তু রসূলে করীম (সা)-এর চুক্তি এরূপ ছিল না। এখানে যা কিছু মুখ অথবা কলম দিয়ে বের হয়ে যেত, তা ধর্মীয় ও আল্লাহ্র নির্দেশের মর্যাদা রাখত এবং তা যথাযথ পালন করা অপরিহার্য হয়ে যেত। আমরের এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) শরীয়তের আইনানুযায়ী নিহত ব্যক্তিদের রক্ত বিনিময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং চাঁদার ব্যাপারে তাঁকে বনূ নুযায়ের গোত্রেও গমন করতে হয়।

ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা বর্তমান রাজনীতিকদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার ঃ আজকালকার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণকল্পে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন, এর জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বিশ্বে মানবাধিকারের হর্তাকর্তা কথিত হন। প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত ঘটনার প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। বনূ নুযায়েরের উপর্যুপরি চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা, রসূল হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক রসূলে করীম (সা)-এর গোচরে আসতে থাকে। যদি এসব ঘটনা আজকালকার কোন মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধানের গোচরীভূত হত তবে ইনসাফের সাথে বলুন তারা এহেন লোকদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? আজকাল তো জীবিত লোকদের উপর পেট্রোল ঢেলে ময়দান পরিষ্কার করে দেওয়া কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। কিছু গুণ্ডা, দুষ্কৃতকারী

সংঘবদ্ধ হয়ে অনায়াসে এ কাজ সমাধা করে ফেলে। রাজকীয় রাগ ও গোসার লীলাখেলা এর চাইতে বেশীই হয়ে থাকে।

কিন্তু এই রাষ্ট্র আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসূল (সা)-এর বনূ নুযায়েরের বিশ্বাসঘাতকতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনও তিনি তাদের গণহত্যার সংকল্প করেন নি। তাদের মাল ও আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা করা হয়নি; বরং তিনি---(১) সব আসবাবপত্র নিয়ে কেবল শহর খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; (২) এর জন্যও তাদেরকে দশ দিনের সময় দেন, যাতে অনায়াসে সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। বনূ নুযায়ের এরপরেও যখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, তখন জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়; তাই (৩) কিছু খর্জুর বৃক্ষ কাটা হয় এবং কিছু বৃক্ষে অগ্নি সংযোগ করা হয়, যাতে তারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু দুর্গে অগ্নি সংযোগ অথবা গণহত্যার নির্দেশ তখনও জারি করা হয়নি; (৪) অতঃপর তারা যখন বেগতিক হয়ে শহর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সামরিক অভিযান সত্ত্বেও এক ব্যক্তি এক উটের পিঠে যে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যেতে পারে সে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হল। ফলে তারা গৃহের কড়িকাঠ, তক্তা এবং দরজার কপাট পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে নিল; (৫) তারা সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন মুসলমান তাদের প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকান নি। শান্ত ও মুক্ত পরিবেশে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ অবস্থায় তারা আসবাবপত্র নিয়ে বিদায় হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) যে সময় শত্রুর কাছ থেকে ষোল আনা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সেই সময় বনূ নুযায়েরের প্রতি তিনি এহেন উদারতা প্রদর্শন করেন। এই বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী শত্রুদের সাথে তাঁর এহেন উদার ব্যবহার, সেই ব্যবহারের নযীর, যা তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাঁর পুরাতন শত্রুদের সাথে করেছিলেন।

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ---বনূ নুযায়েরের এই নির্বাসনকে কোরআন পাক 'আউয়ালে হাশর' তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা এক জায়গায় বসবাস করত। স্থানান্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল। এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদ্বীপকে অমুসলিমদের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দ্বিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এটা হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খায়বরে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিক দিয়ে বনূ নুযায়েরের এই নির্বাসন প্রথম সমাবেশ এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন দ্বিতীয় সমাবেশ নামে অভিহিত হয়।

فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا — এর শাব্দিক অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কল্পনাও করেনি। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্র আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা।

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ — গৃহের দরজা, কপাট ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ

وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ — لِيْنَةٍ শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ। বনূ নুযায়েরের খর্জুর বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্য তাদের কিছু খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নি সংযোগ করে খতম করে দিল। অপর কিছুসংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ্ বিজয় তাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগবাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হল। এতে উভয় দলের কার্যক্রমকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

রসূলের নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই নির্দেশ : হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি : এই আয়াতে বৃক্ষ কর্তন, পোড়ান ও অক্ষত ছেড়ে দেওয়ায় উভয় প্রকার কার্যক্রমকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ কোরআনের কোন আয়াতে এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন কর্মের আদেশ উল্লেখ করা হয়নি। অতএব বাহ্যত বোঝা যায় যে, উভয় দল নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে এ কাজ করেছে। বেশীর বেশী তারা হয় তো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে এর অনুমতি নিয়ে থাকবে, কিন্তু কোরআন এই অনুমতি তথা হাদীসকে আল্লাহ্র ইচ্ছা প্রতিপন্ন করে ব্যক্ত করেছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এবং তিনি যে আদেশ জারি করবেন, তা আল্লাহ্রই আদেশ বলে গণ্য হবে। এই আদেশ পালন করা কোরআনের আয়াত পালন করার মত ফরয।

ইজতিহাদী মতভেদে কোন পক্ষকে গোনাহ্ বলা যাবে না : এই আয়াত থেকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই জানা গেল যে, যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন, কোন ব্যাপারে

তাদের ইজতিহাদ ভিন্নমুখী হলে অর্থাৎ একদলে জায়েয ও অন্যদলে নাজায়েয বললে আল্লাহ্‌র কাছে উভয়টিই শুদ্ধ হবে। উভয় ইজতিহাদের মধ্যে কোনটিকে গোনাহ্ বলা যাবে না। এ কারণে তাদের উপর দুষ্টের দমন আইন প্রযোজ্য হবে না। কেননা, তাদের মধ্যে কোন এক পক্ষও শরীয়তানুযায়ী অশিষ্ট নয়। وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ বাক্যে বৃক্ষ কর্তন ও অগ্নি সংযোগের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা অনর্থ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে এটা সওয়াবের কাজ।

মাস'আলা ঃ যুদ্ধাবস্থায় কাফিরদের গৃহ বিধ্বস্ত করা, অগ্নি সংযোগ করা এবং বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ফিকহ্‌বিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ যুদ্ধাবস্থায় এসব কাজ জায়েয। কিন্তু শায়খ ইবনে হুমাম (র) বলেন ঃ এটা তখন জায়েয, যখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সুদূর পরাহত হয় অথবা যখন মুসলমানদের বিজয় অনিশ্চিত হয়। কাফিরদের শক্তি চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিজয় অর্জিত না হলে তাদের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে তাদেরকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তখন এসব কাজ জায়েয হবে।—(মাযহারী)

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا

رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ

قَدِيْرٌ ۝ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ

الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ

اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا

وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ

الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ

فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ
جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ
سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ
اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

(৬) আল্লাহ্ বনূ নুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৭) আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৮) এই ধনসম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধনসম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। (৯) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১০) আর এই সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বনূ নুযায়েরের জীবন সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এখন তাদের মাল সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ বনূ নুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, (তাতে তোমাদের কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি) তোমরা তজ্জন্য (অর্থাৎ তা হাসিল করার জন্যে) ঘোড়া ও উটে চড়ে যুদ্ধ করনি। [উদ্দেশ্য এই যে, মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে সফরও করতে হয়নি এবং যুদ্ধ করারও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মুকাবিলা যা হয়েছে, তা নেহায়েত অনুল্লেখযোগ্য।---(রূহুল-মা'আনী) তাই এই মালে তোমাদের বন্টন ও মালিকানার অধিকার নেই---

গনীমতের মালে যেরূপ হয়ে থাকে]। কিন্তু (আল্লাহ্‌র রীতি এই যে) তিনি তাঁর রসূলগণকে (শত্রুদের মধ্য থেকে] যার উপর ইচ্ছা, কর্তৃত্ব দান করেন (অর্থাৎ শত্রুকে ত্রাসের মাধ্যমে পরাস্ত করে দেন, যাতে কোন রকম কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। সেমতে রসূলগণের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা)-কে বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদের উপর এমনিভাবে কর্তৃত্ব দান করেছেন। কাজেই এতে তোমাদের কোন অধিকার নেই ; বরং একে মালিকসুলভ ব্যবহার করার পূর্ণ ক্ষমতা রসূলেরই আছে)। আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সুতরাং তিনি যেভাবে ইচ্ছা, শত্রুদেরকে পরাস্ত করবেন এবং যেভাবে ইচ্ছা, তাঁর রসূলকে ক্ষমতা দেবেন। বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদের ক্ষেত্রে যেমন এই বিধান, তেমনিভাবে) আল্লাহ্ তা'আলা (এই পন্থায়) অন্যান্য জনপদের (কাফির) অধিবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, (যেমন ফদকের বাগান এবং খায়বরের অংশ বিশেষ এই পন্থায়ই করতলগত হয়েছিল, তাতেও তোমাদের কোন মালিকানার অধিকার নেই ; বরং) তা আল্লাহ্‌র হক, (তিনি যেভাবে ইচ্ছা, তা ব্যয় করার আদেশ দেবেন) রসূলের (হক ; আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী এই মাল ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন) এবং (তাঁর) আত্মীয়-স্বজনের (হক) এবং ইয়াতীমদের (হক) এবং নিঃস্বদের (হক) এবং মুনাফিকদের [হক অর্থাৎ তারা সবাই রসূলের বিবেচনা অনুসারে এই মাল ব্যয় করার পাত্র। শুধু তারাই নয় রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের মতে যাকেই দিতে চান, সে-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের যখন এই মালে কোন অধিকার নেই, তখন উপরোক্ত প্রকার লোকগণ, যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরও এই মালে কোন অধিকার থাকবে না--এই সন্দেহ নিরসনের জন্য সম্ভবত উপরোক্ত প্রকার লোকদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতে ইয়াতীম, নিঃস্ব, মুসাফির ইত্যাদি বিশেষ গুণসহ তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা এসব গুণের কারণে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইচ্ছাক্রমে এই মাল পেতে পারে। জিহাদে যোগদান করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আত্মীয়-স্বজন হওয়াও উপরোক্ত গুণসমূহের অন্যতম। তাঁদেরকে এই মাল দেওয়ার কারণ এই যে, তাঁরা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহায্যকারী ছিলেন এবং বিপদ মুহূর্তে কাজে লাগতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের সাথে সাথে তাঁদের এই অংশ রহিত হয়ে যায়। সূরা আনফালের আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান এ জন্য] যাতে তা (অর্থাৎ এই ধনসম্পদ) কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়ে যায় ; (যেমন মূর্খতা যুগে গনীমতের মাল ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সব বিত্তবানরা হজম করে ফেলত এবং অভাবগ্রস্তরা বঞ্চিত থাকত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বিষয়টি রসূলের মতামতের উপর ন্যস্ত করেছেন এবং ব্যয় করার খাতও বলে দিয়েছেন। যাতে মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি অভাবগ্রস্তদের মধ্যে এবং উপযোগিতার স্থলে ব্যয় করবেন। যখন জানা গেল যে, রসূলের ইখতিয়ারে থাকাই মঙ্গলজনক, তখন) রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা (নিতে) নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক (অন্যান্য) যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও তাই বিধান এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ (বিরুদ্ধাচরণের কারণে) কঠোর শাস্তিদাতা। (উপরোক্ত ধনসম্পদে এমনিতে সব অভাবগ্রস্তরই হক আছে, কিন্তু) মুহাজির অভাবগ্রস্তদের (বিশেষভাবে) এতে হক আছে, যাদেরকে তাদের বাস্তুভিটা ও

ধনসম্পদ থেকে (জোরজবরে অন্যায়ভাবে) বহিষ্কার করা হয়েছে, (অর্থাৎ কাফিরদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তারা বাস্তুভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। এই হিজরত দ্বারা) তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (অর্থাৎ জান্নাত) ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, (কোন পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরত করেনি) এবং তারা আল্লাহ্ ও রসূলের (ধর্মের) সাহায্য করে। তারাই (ঈমানে) সত্যবাদী (এই সম্পদ তাদের জন্যও) যারা দারুল-ইসলামে (অর্থাৎ মদীনায়) ও ঈমানে মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে স্থিতিশীল ছিল। (এখানে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা ছিলেন মদীনার বাসিন্দা। তাই তাঁরা পূর্বেই মদীনায় স্থিতিশীল ছিলেন। ঈমানের পূর্বে স্থিতিশীল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সব আনসারের ঈমান সব মুহাজিরের ঈমানের অগ্রে ছিল। বরং অর্থ এই যে, মুহাজিরগণের মদীনায় আগমনের পূর্বেই তাঁরা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন)। তাঁরা মুহাজিরগণকে ভালবাসে এবং মুহাজিরগণকে (গনীমতের মাল ইত্যাদি) যা দেওয়া তজ্জন্য তাঁরা (আনসাররা) অন্তরে কোন ঈর্ষা পোষণ করে না। (বরং আরও বেশী ভালবাসে) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও (পানাহার ইত্যাদিতে) তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। (অর্থাৎ মাঝে মাঝে নিজেরা না খেয়ে মুহাজির ভাইকে খাইয়ে দেয়। বাস্তবিকই) যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত (যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লোভ-লালসা ও তদনুযায়ী কাজ করা থেকে মুক্ত রেখেছেন), তারাই সফলকাম। (আর এই সম্পদ তাদের জন্যও) যারা (দারুল ইসলাম অথবা হিজরতে অথবা দুনিয়াতে) তাদের (অর্থাৎ উপরোক্ত মুহাজিরদের) পরে আগমন করেছে, (কিংবা আগমন করবে)। তারা দোয়া করে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর (শুধু ঈমানে অগ্রণী কিংবা হিজরতের উপর নির্ভরশীল কামিল ঈমানে অগ্রণী যাই হোক না কেন)। এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে কোন হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। (এই দোয়ায় সমসাময়িকগণও শামিল রয়েছে)। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ — أَفَاءَ শব্দটি فَيْءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও فَيْءٌ বলা হয়। কাফিরদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের স্বরূপ এই যে, কাফিররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধনসম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনকে أَفَاءَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধনসম্পদকেই فَيْءٌ বলা হত। কিন্তু যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধনসম্পদকে 'গনীমত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ——কিন্তু যে ধনসম্পদ অর্জনে যুদ্ধ ও জিহাদের প্রয়োজন পড়ে না, তাকে فَيْءٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধনসম্পদ যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বন্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন, দেবেন অথবা নিজের জন্য রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদের বন্টন সীমিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى——এখানে اهل قرى বলে বনূ নুযায়ের এবং তাদের মত বনূ কোরায়যা ইত্যাদি গোত্র বোঝানো হয়েছে, যাদের ধনসম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অর্জিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে উপরোক্ত প্রকার ধনসম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বন্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালের শুরুতে গনীমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদের ফলশ্রুতিতে যে ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল এবং যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে যা অর্জিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফিররা যে ধনসম্পদ রেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্মতিক্রমে জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত।

এর কিঞ্চিত বিবরণ মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে সূরা আনফালের শুরুতে এবং আরও কিছু বিবরণ সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে ফায়-এর সম্পর্কে প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আনফালে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

উভয় আয়াতে ছয় প্রকার হকদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে---আল্লাহ্, রসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলা তো ইহকাল, পরকাল এবং সমগ্র সৃষ্ট জগতের আসল মালিক। অংশ বর্ণনায় তাঁর নাম নিছক বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে ইঙ্গিত হয়ে যায় যে, এই ধনসম্পদ অভিজাত, হালাল ও পূত-পবিত্র। এক্ষেত্রে অধিকাংশ তফসীরবিদের বক্তব্য তাই।---(মাযহারী)

আল্লাহ্ তা'আলার নাম উল্লেখ করার ফলে এই ধনসম্পদের আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্র হওয়ার দিকে কিভাবে ইঙ্গিত হল, এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আনফালের তফসীরে প্রদান করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে অর্জিত সদকার মাল হালাল করেন নি। ফায় ও গনীমতের মাল কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই মাল পয়গম্বরগণের জন্য কিরূপে হালাল হল? এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলার নাম উল্লেখ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বস্তুর মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি কৃপাবশত বিশেষ আইনের অধীনে মানুষকে মালিকানা দান করেছেন। কিন্তু যে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যায়, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথমে পয়গম্বরগণকে ঐশী নির্দেশসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যারা এতেও সঠিক পথে আসে না, তাদেরকে কমপক্ষে ইসলামী আইনের বশ্যতা স্বীকার করে নির্ধারিত জিযিয়া, খারাজ ইত্যাদি আদায় করে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যারা এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে, তাদের মুকাবিলায় জিহাদ ও যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাদের জান ও মাল সম্মানার্হ নয়। তাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র সরকারে বাজেয়াপ্ত। জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয়, তা কোন মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়---বরং তা সরাসরি আল্লাহ্র মালিকানায় ফিরে যায়। 'ফায়' শব্দের মধ্যে এই ফিরে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিতও আছে। কারণ, এর আসল অর্থ ফিরে যাওয়া। সত্যিকার মালিক আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানায় ফিরে যাওয়ার কারণেই এই সম্পদকে 'ফায়' বলা হয়। এখন এতে মানুষের মালিকানার কোন দখল নেই। যেসব হকদারকে এ থেকে অংশ দেওয়া হবে; তা সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। কাজেই এই ধনসম্পদ আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এবং স্বউদগত ঘাসের ন্যায় আল্লাহ্র দান হিসাবে মানুষের জন্য হালাল ও পবিত্র হবে।

সারকথা এই যে, এ স্থলে আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে হকদারদেরকে প্রদান করা হয়। এটা কারও সদকা খয়রাত নয়।

এখন সর্বমোট হকদার পাঁচ রয়ে গেল---রসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির। গনীমতের পঞ্চমাংশের হকদারও তারাই, যা সূরা আনফালে বর্ণিত হয়েছে। গনীমত ও ফায় উভয় প্রকারের বিধান এই যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সম্পূর্ণ ইখতিয়ারে থাকবে। তাঁরা ইচ্ছা করলে এগুলো কাউকে না দিয়ে মুসলিম জনগণের স্বার্থে বায়তুলমালে জমা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে বণ্টনও করতে পারেন। তবে বণ্টন করলে তা উপরোক্ত পাঁচ প্রকার হকদারের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে।---(কুরতুবী)

খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের কর্মধারাদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে তো ফায়-এর মাল তাঁর ইখতিয়ারে ছিল। তিনি যেখানে ভাল বিবেচনা করতেন ব্যয় করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই মাল খলীফাগণের ইখতিয়ারে ছিল।

এই মালে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যে অংশ ছিল তা তাঁর ওফাতের পর মওকুফ হয়ে যায়। তাঁর আত্মীয়বর্গকে এই মাল থেকে অংশ দেওয়ার দ্বিবিধ কারণ ছিল। এক. তাঁরা ইসলামী কর্মকাণ্ডে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহায্য করতেন। তাই বিত্তশালী আত্মীয়বর্গকেও এ থেকে অংশ দেওয়া হত।

দুই. রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বজনদের জন্য সদকার মাল হারাম করা হয়েছিল। তাই তাঁদের নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তগণকে ফায়-এর মাল থেকে এর পরিবর্তে অংশ দেওয়া হত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর সাহায্য খতম হয়ে যায়। ফলে বিত্তশালী স্বজনদের অংশও রসূল (সা)-এর অংশের ন্যায় মওকুফ হয়ে যায়। তবে অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনের অংশ অভাবগ্রস্ততার কারণে অব্যাহত রয়েছে। তারা অন্য অভাবগ্রস্তদের মুকাবিলায় অগ্রগণ্য হবেন।---(হিদায়া)

كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ---যে সম্পদ পরস্পরে আদান-প্রদান হয়, তাকে دُولَةٌ বলা হয়।---(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই যে, উপরোক্ত ধনসম্পদের হকদার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিত্তশালী-দের মধ্যকার পুঞ্জীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মূর্খতা যুগের একটি কু-প্রথার মূলোৎ-পাটনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অংশ থাকত না।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার প্রতি ইসলামী আইনের মরণাঘাত ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব পালক। তাঁর সৃজিত হওয়ার দিক দিয়ে মানবিক প্রয়োজনের সম্পদরাজিতে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। এতে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যেও কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। অতএব পরিবারগত ও শ্রেণীগত এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য রাখার তো প্রশ্নই উঠে না। বায়ু, শূন্যমণ্ডল, সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের আলো, শূন্যমণ্ডলে সৃষ্ট মেঘমালা, বৃষ্টি---এগুলো মানুষের সহজাত ও আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। এগুলো ব্যতীত মানুষ সামান্যক্ষণও জীবিত থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো স্বহস্তে রেখে এভাবে বন্টন করেছেন, যাতে প্রতি স্তর ও প্রতি ভূখণ্ডের দুর্বল ও সবল মানুষ এগুলো দ্বারা সমভাবে উপকৃত হতে পারে। এ ধরনের দ্রব্য সামগ্রীকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রজ্ঞা বলে সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়া ও একচ্ছত্র অধিকারের উর্ধ্বে রেখেছেন। ফলে এগুলোর উপর ব্যক্তিগত দখল প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য কারও নেই। এগুলো ওয়াক্ফে আম। কোন বৃহত্তর সরকার ও পরাশক্তি এগুলোকে কুক্ষিগত করতে সক্ষম নয়। সৃষ্ট জীব সর্বত্রই এগুলো সমভাবে লাভ করে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দ্বিতীয় কিস্তি হচ্ছে ভূগর্ভ থেকে উদগত পানি ও আহার্য বস্তু। এগুলো যদিও সাধারণ ওয়াক্ফ নয়, কিন্তু ইসলামী আইনে পাহাড়, অনাবাদী জঙ্গল ও প্রাকৃতিক জলস্রোতকে সাধারণ ওয়াক্ফ রেখে এগুলোর কতকাংশের উপর বিশেষ বিশেষ লোকের বৈধ মালিকানার অধিকারও দেওয়া হয়। অপরদিকে অবৈধ দখল প্রতিষ্ঠা-কারীরাও ভূমির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে নেয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কোন বৃহত্তর পুঁজিপতি

ও দরিদ্র, কৃষক ও শ্রমিকদেরকে সাথে না নিয়ে ভূগর্ভে নিহিত সম্পদরাজি অর্জন করতে পারে না। কাজেই দখল প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও পুঁজিপতিরা অপরাপর দরিদ্রদেরকে অংশীদার করতে বাধ্য থাকে।

তৃতীয় কিস্তি হচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য ও টাকা-পয়সা। এগুলো আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর তালিকাভুক্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অর্জনের উপায় করেছেন। খনি থেকে উত্তোলন করার পর বিশেষ আইনের অধীনে এগুলো উত্তোলনকারীর মালিকানাধীন হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন পন্থায় অন্য লোকদের দিকে মালিকানা স্থানান্তরিত হতে থাকে। যদি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে এগুলো যথাযথ পন্থায় আবর্তিত হয়, তবে কোন মানুষ ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ এগুলো দ্বারা কেবল নিজেই উপকৃত হতে চায়, অন্যান্য লোকও উপকৃত হোক, তা চায় না। এই কার্পণ্য ও লালসা দুনিয়াতে সম্পদ ও পুঁজি আহরণের নতুন ও পুরাতন অনেক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যার ফলে সম্পদের আবর্তন কেবল পুঁজিপতি ও বিত্তশালীদের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এর অশুভ প্রতিক্রিয়াই আজ দুনিয়াতে কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের মত অযৌক্তিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে।

ইসলামী আইন একদিকে ব্যক্তি মালিকানার প্রতি এতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেছে যে, এক ব্যক্তির সম্পদকে তার প্রাণের সমান এবং প্রাণকে বায়তুল্লাহ্র সমান গুরুত্ব দান করেছে। এর উপর কারও অবৈধ হস্তক্ষেপকে কঠোরভাবে বারণ করেছে। অপরদিকে যে হাত অবৈধ পন্থায় এই সম্পদের দিকে অগ্রসর হয় সেই হাত কেটে দিয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে দ্রব্যসামগ্রীর উপর কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

অর্থোপার্জনের প্রচলিত পন্থাসমূহের মধ্যে সুদ সট্টা ও জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ সংকুচিত হয়ে কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। ইসলাম এগুলোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা ইত্যাদি কাজ-কারবারে এগুলোর মূল কেটে দিয়েছে। যে অর্থ-সম্পদ কোন ব্যক্তির কাছে বৈধ পন্থায় সঞ্চিত হয়, তাতেও যাকাত, ওশর, ফিতরা, কাফ্ফারা ইত্যাদি ফরয কর্মের আকারে এবং অতিরিক্ত স্বেচ্ছামূলক দানের আকারে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এসব ব্যয়বহনের পরও মৃত্যুর সময় ব্যক্তির কাছে যে অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায়, তা এক বিশেষ প্রজ্ঞাভিত্তিক নীতিমালা অনুযায়ী মৃতের নিকট থেকে নিকটতম স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। ইসলাম এই ত্যাজ্য সম্পদ সাধারণ দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করার আইন রচনা করেনি। কারণ, এরূপ করলে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই তার সম্পদ অযথা ব্যয় করে নিঃশেষ করে দিতে স্বভাবগত কারণেই আগ্রহী হত। এখন তারই আত্মীয় ও প্রিয়জন পাবে দেখে তার অন্তরে এই প্রেরণা লালিত হবে না।

অর্থোপার্জনের অপর পন্থা হচ্ছে যুদ্ধ ও জিহাদ। এই পন্থায় অর্জিত ধনসম্পদ সুষ্ঠু বন্টনের জন্য ইসলাম যে নীতিমালা অবলম্বন করেছে, তার কিয়দংশ সূরা আনফালে এবং

কিয়দংশ এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেমন জ্ঞানপাপী তারা, যারা ইসলামের এহেন ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ছেড়ে নতুন ইজম অবলম্বন করে বিশ্ব শান্তির পায়ে কুঠারাঘাত করছে।

এই—وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ আয়াত ফায়-এর মাল বণ্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর উপযুক্ত অর্থ এই যে, ফায়-এর মাল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা হকদারদের শ্রেণী বর্ণনা করেছেন ঠিক; কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে কতটুকু দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুবিবেচনার উপর রেখে দিয়েছেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে যে পরিমাণ দেন, তা সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা করো না। অতঃপর اتَّقُوا اللَّهَ বলে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ভ্রান্ত ছলচাতুরির মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে নিলেও আল্লাহ্ তা'আলা সব খবর রাখেন। তিনি এজন্য শাস্তি দেবেন।

রসূলের নির্দেশ কোরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয়ঃ কিন্তু আয়াতের ভাষা ধন সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং শরীয়তের বিধি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপক ভঙ্গিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা ধনসম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা দরকার।

অনেক সাহাবায়ে কিরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রত্যেক নির্দেশকে কোরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন। কুরতুবী বলেনঃ আয়াতে آتَى শব্দের বিপরীতে نَهَى শব্দ ব্যবহার করায় বোঝা যায় যে, এখানে آتَى শব্দের অর্থ أَمَرَ অর্থাৎ যা আদেশ করেন। কারণ এটাই نَهَى এর বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ। তবে কোরআন পাক এর পরিবর্তে آتَى শব্দ এজন্য ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়'-এর মাল বণ্টন সম্পর্কিত বিষয়বস্তুও এতে শামিল থাকে। কারণ, এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি আনা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) জনৈক ব্যক্তিকে ইহ্রাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বললঃ আপনি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত বলতে পারেন কি, যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আয়াত আছে; অতঃপর তিনি وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ আয়াতটি পাঠ করে দিলেন। ইমাম শাফেয়ী একবার

উপস্থিত লোকজনকে বললেন ঃ আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াব কোরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর যা জিজ্ঞাসা করতে চাও। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ এক ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেয়ী (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।---(কুরতুবী)

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ — রুকূর শেষ পর্যন্ত এই কয়েকটি আয়াতে দরিদ্র মুহাজির, আনসার ও তাঁদের পরবর্তী সাধারণ উম্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাকরণিক দিক দিয়ে للفقراء-শব্দটি لذى القربى থেকে بدل হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে।---(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণ ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্ততার কারণে ফায়-এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকীন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ, তাঁদের ধর্মীয় খিদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।

সদকার মালে ধর্মপরায়ণ ও দীনের খিদমতে নিয়োজিত অভাবগ্রস্তদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ঃ এ থেকে বোঝা গেল যে, সদকার মাল বিশেষত ফায়-এর মাল সাধারণ অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার জন্য হলেও তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, ধার্মিক, বিশেষত দীনের খিদমতে নিয়োজিত তালিবে-ইলম ও আলিম, তাদেরকে অন্যদের চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষা, প্রচার ও জনসংস্কারের কাজে নিয়োজিত আলিম, মুফতী ও বিচারকগণকে ফায়-এর মাল থেকে খোরপোশ দেওয়ার প্রচলন ছিল। কেননা, আলোচ্য আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামকেও প্রথমে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এক. মুহাজির, যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য অভূতপূর্ব ত্যাগ স্বীকার করেন এবং ইসলামের জন্য ঘোরতর বিপদাপদ হাসিমুখে বরণ করে নেন। অবশেষে সহায়-সম্পত্তি স্বদেশ ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেন। দুই. আনসার যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথী মুহাজিরগণকে মদীনায় ডেকে এনে সারা দুনিয়ার মানুষকে নিজেদের শত্রুতে পরিণত করেন এবং তাঁদের এমন আতিথেয়তা করেন, যার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দুই শ্রেণীর পর তৃতীয় শ্রেণী সেসব মুসলমানের সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা সাহাবায়ে কিরামের পর ইসলাম গ্রহণ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই তিন শ্রেণীর কিছু শ্রেষ্ঠত্ব, গুণ গরিমা ও দীনের খিদমত বর্ণনা করা হয়েছে।

মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বদেশ ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমর্থক ও সাহায্যকারী, শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফিররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধনসম্পদ ও বাস্তুভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীতবস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আত্ম রক্ষা করতেন।---(মাযহারী, কুরতুবী)

মুসলমানদের ধনসম্পদের উপর কাফিরদের দখল সম্পর্কিত বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে মুহাজিরগণকে ফকীর বলা হয়েছে। ফকীর সেই ব্যক্তি, যার মালিকানায় কিছু না থাকে অথবা নিসাব পরিমাণ কোন কিছু না থাকে। মক্কায় তাঁদের অধিকাংশই ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্বলের অধিকারী ছিলেন। হিজরতের পরও যদি সেই ধনসম্পদ তাঁদের মালিকানায় থাকত, তবে তাঁদেরকে ফকীর ও নিঃস্ব বলা ঠিক হত না। কোরআন পাক তাঁদেরকে ফকীর বলে ইঙ্গিত করেছে যে, হিজরতের পর তাঁদের মক্কায় পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁদের মালিকানা থেকে বের হয়ে কাফিরদের দখলে চলে গেছে।

এ কারণেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ যদি মুসল-মান কোন জায়গায় হিজরত করে চলে যায় এবং তাদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি কাফিররা দখল করে নেয় অথবা আল্লাহ্ না করুন কোন দারুল-ইসলাম কাফিররা অধিকার করে মুসলমানদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবে এসব ধনসম্পদ কাফিরদের পুরোপুরি দখলের পর তাদের মালিকানায় চলে যায়। এগুলো বেচাকেনা ইত্যাদি কার্যকলাপ আইনসিদ্ধ হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ স্থলে তফসীরে মাযহারীতে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাজিরগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا অর্থাৎ তাঁরা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন নি এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধনসম্পদ ত্যাগ করেন নি বরং কেবলামাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। فضل শব্দটি প্রায়শ পার্থিব নিয়ামতের জন্য এবং رضوان শব্দটি পারলৌকিক নিয়ামতের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঘরবাড়ী, বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নিয়ামত কামনা করছেন।

মুহাজিরগণের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলকে সাহায্য করার জন্য তাঁরা উপরোক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহ্কে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা বিস্ময়কর।

তাঁদের চতুর্থ গুণ হচ্ছে أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ — অর্থাৎ তাঁরাই কথা ও কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কলেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলমান হতে পারে না। নাউযুবিল্লাহ্! রাফেযী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। রসূলে করীম (সা) এই ফকীর মুহাজিরগণের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতেন। এতেই বোঝা যায় যে, হুযুরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল।---(মাযহারী)

আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব : وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

تَبَوَّء শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ করা। دار বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়েবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইমাম মালিক (র) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌঁছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, সেগুলো জিহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি, মক্কা মোকাররমাও। একমাত্র মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঈমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ করেছে।---(কুরতুবী)

আয়াতে تَبَوَّءُوا ক্রিয়াপদের পর دار এর সাথে ঈমানও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অবস্থান গ্রহণ কোন স্থান ও জায়গায় হতে পারে। ঈমান কোন জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন : এখানে خلصوا অথবা تمكنوا ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ঈমানে খাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ঈমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ মুহাজিরগণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তা এই যে, যে শহর আল্লাহ্র কাছে 'দারুল-হিজরত' ও 'দারুল-ঈমান' হওয়ার ছিল, তাতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ঈমান কবূল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ অর্থাৎ তাঁরা তাদেরকে ভালবাসেন

যারা হিজরত করে তাঁদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণত লোকেরা এহেন ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেওয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেন নি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধনসম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইয্যত ও সম্ভ্রমের সাথে তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেওয়ার জন্য এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমেও এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে।---(মাযহারী)

তাঁদের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً

مِّمَّا اُوْتُوْا এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনূ নুযায়েরের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল।

বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদ বণ্টনের ঘটনা ঃ যে সময় বনূ নুযায়ের গোত্রের ফায়-এর ধনসম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টনের ইখতিয়ার রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেওয়া হয়, তখন মুহাজিরগণ ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। তাঁদের না ছিল নিজস্ব কোন বাড়ী-ঘর এবং না ছিল বিষয়-সম্পত্তি। তাঁরা আনসারগণের গৃহে বাস করতেন এবং তাঁদেরই বিষয়-সম্পত্তিতে মেহনত মজদুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফায়-এর সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারগণের সর্দার সাবেত ইবনে কায়স (রা)-কে ডেকে বললেন ঃ তুমি আনসারগণকে আমার কাছে ডেকে আন। সাবেত জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার নিজের গোত্র খাযরাজের আনসারগণকে ডাকব, না সব আনসারকে ডাকব? রসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ না, সবাইকে ডাকতে হবে। অতঃপর তিনি আনসারগণের এক সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। হামদ ও সালাতের পর তিনি মদীনার আনসারগণের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন ঃ আপনারা আপনাদের মুহাজির ভাইদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন, তা নিঃসন্দেহে অনন্য সাধারণ সাহসিকতার কাজ। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদ আপনাদের করতলগত করে দিয়েছেন। যদি আপনারা চান, তবে আমি এই সম্পদ মুহাজির ও আনসার সবার মধ্যে বন্টন করে দেব এবং মুহাজিরগণ পূর্ববৎ আপনাদের গৃহেই বসবাস করবে। পক্ষান্তরে আপনারা চাইলে আমি এই সম্পদ কেবল গৃহহীন ও সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরগণের মধ্যেই বণ্টন করে দেব এবং এরপর তারা আপনাদের গৃহ ত্যাগ করে আলাদা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে নেবে।

এই বক্তৃতা শুনে আনসারগণের দুই জন প্রধান নেতা সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) দণ্ডায়মান হলেন এবং আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)! আমাদের অভিমত এই যে, এই ধনসম্পদ আপনি সম্পূর্ণই কেবল মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন এবং তাঁরা এরপরও পূর্ববৎ আমাদের গৃহে বসবাস করুন। নেতাদ্বয়ের এই উক্তি

শুনে উপস্থিত আনসারগণ সমস্বরে বলে উঠলেন ঃ আমরা এই সিদ্ধান্তে সম্মত ও আনন্দিত। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সকল আনসার ও তাঁদের সন্তানগণকে দোয়া দিলেন এবং ধনসম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আনসারগণের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি অর্থাৎ সহল ইবনে হানীফ ও আবূ দুজানাকে অত্যধিক অভাবগ্রস্ততার কারণে অংশ দিলেন। গোত্রনেতা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা)-কে ইবনে আবী হাকীকের একটি বিখ্যাত তরবারি প্রদান করা হল।---(মাযহারী)

উল্লিখিত আয়াতে حَاجَةً বলে প্রয়োজনের বস্তু এবং مِمَّا أُوتُوا এর সর্বনাম দ্বারা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, এই বণ্টনে যা কিছু মুজাহিরগণকে দেওয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন; যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজনই ছিল না। মুহাজিরগণকে দেওয়াকে খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর মুকাবিলায় যখন বাহরাইন বিজিত হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রাপ্ত ধনসম্পদ সম্পূর্ণই আনসারগণের মধ্যে বিলিবণ্টন করে দিতে চাইলেন; কিন্তু তাঁরা তাতে রাযী হলেন না, বরং বললেন ঃ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধনসম্পদ থেকে অংশ না দেওয়া হয়।---(বুখারী, ইবনে কাসীর)

আনসারগণের চতুর্থ গুণ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ — خَصَاصَةٌ শব্দের অর্থ দারিদ্র্য ও উপবাস। اِيْثَار-এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা। আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন; যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ছিলেন।

সাহাবীগণের, বিশেষত আনসারগণের আত্মত্যাগের কয়েকটি ঘটনা ঃ আয়াতের তফসীরের জন্য ঘটনাবলী বর্ণনা করা জরুরী নয়, কিন্তু এসব ঘটনা মানুষকে উৎকৃষ্ট মানবতা শিক্ষা দেয় এবং জীবনে বিপ্লব আনয়ন করে। তাই তফসীরবিদগণ এ স্থলে এসব ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এখানে তফসীরে কুরতুবী থেকে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হল।

তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, জনৈক আনসারীর গৃহে রাত্রিবেলায় একজন মেহমান আগমন করল। তাঁর কাছে এই পরিমাণ খাদ্য ছিল, যা তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তানগণ খেতে পারেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন ঃ বাচ্চাদেরকে কোনরূপে শুইয়ে দাও। অতঃপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে মেহমানের সামনে

আহার্য রেখে কাছাকাছি বসে যাও, যাতে মেহমান মনে করে যে, আমরাও খাচ্ছি ; কিন্তু আসলে আমরা খাব না। এভাবে মেহমান পেট ভরে খেতে পারবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ আয়াতখানি নাযিল হয়।

তিরমিযীতেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমি ক্ষুধায় অতিষ্ঠ। তিনি একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে জওয়াব আসল ঃ আমার কাছে এক্ষণে পানি ব্যতীত কিছুই নেই। অন্য একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে সেখানে থেকেও তাই জওয়াব আসল। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ এমনকি, সকল বিবির কাছে খোঁজ নেওয়া হলে সবার কাছ থেকে একই জওয়াব পাওয়া গেল যে, পানি ব্যতীত গৃহে কিছুই নেই। অগত্যা রসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ কে আছ, যে এই ব্যক্তিকে আজ রাত অতিথি করে নেবে? জনৈক আনসারী আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমি করব। অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং গৃহে পৌঁছে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিছু খাবার আছে কি? উত্তর হল ঃ আমাদের বাচ্চারা খেতে পারে, এই পরিমাণ খাদ্য আছে। আনসারী বললেন ঃ বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দাও। অতঃপর মেহমানের সামনে খাবার রেখে আমরাও সাথে বসে যাব। এরপর বাতি নিভিয়ে দেবে, যাতে মেহমান আমাদের না খাওয়ার বিষয় জানতে না পারে। সেমতে মেহমান আহার করল। সকালে আনসারী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ গতরাতে তুমি মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ, তা আল্লাহ্ তা'আলা অত্যধিক পছন্দ করেছেন।

মেহদভী হযরত সাবেত ইবনে কায়সের সাথে জনৈক আনসারীর এমনি ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতে প্রত্যেক ঘটনার সাথে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

কুশায়রী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মান্যবর সাহাবীর কাছে এক ব্যক্তি একটি বকরীর মাথা উপঢৌকন পেশ করেন। সাহাবী মনে করলেন আমার অমুক ভাই ও তাঁর বাচ্চারা আমার চাইতে বেশী অভাবগ্রস্ত। সেমতে তিনি মাথাটি তার কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও এমনি-ভাবে তৃতীয় জনের কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে সাতটি গৃহে যাওয়ার পর মাথাটি আবার প্রথম সাহাবীর গৃহে ফিরে এল। এই ঘটনার পরি-প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। সা'লাবী হযরত আনাস (রা) থেকেও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে কিছু চাইল। তাঁর গৃহে তখন একটি মাত্র রুটি ছিল এবং তিনি সেদিন রোযা রেখেছিলেন। তিনি পরিচারিকাকে বললেন ঃ এই রুটি তাকে দিয়ে দাও। পরিচারিকা বলল ঃ এই রুটি দিয়ে দিলে আপনার ইফতার করার কিছু থাকবে না। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ না থাক, তুমি দিয়ে দাও। পরিচারিকা বর্ণনা করে---যখন সন্ধ্যা হল, তখন উপঢৌকন

প্রেরণে অভ্যস্ত নয়---এমন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশার কাছে একটি আস্ত ভাজা করা বকরী উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করল। তার উপর ময়দার আটার আবরণী ছিল। আরবে একে সর্বোত্তম খাদ্য মনে করা হত। হযরত আয়েশা (রা) পরিচারিকাকে ডেকে বললেন ঃ খাও, এটা তোমার সেই রুটি থেকে উত্তম।

নাসায়ী বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর অসুস্থ অবস্থায় আঙুর খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে এক দিরহামের বিনিময়ে এক গুচ্ছ আঙুর কিনে আনা হয়। ঘটনাক্রমে তখন এক মিসকীন এসে উপস্থিত হল এবং কিছু চাইল। অসুস্থ ইবনে ওমর বললেন ঃ আঙুরের গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দাও। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি গোপনে মিসকীনের পেছনে পেছনে গেল এবং গুচ্ছটি তার কাছ থেকে কিনে হযরত ইবনে ওমরের সামনে পেশ করল। কিন্তু ভিক্ষুকটি আবার আসল এবং কিছু চাইল। হযরত ইবনে ওমর পুনরায় গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দিলেন। আবার এক ব্যক্তি গোপনে ভিক্ষুকের পেছনে পেছনে যেয়ে এক দিরহামের বিনিময়ে গুচ্ছটি কিনে আনল এবং হযরত ইবনে ওমরের কাছে পেশ করল। ভিক্ষুকটি আবার ধরনা দিতে চাইলে সবাই তাকে নিষেধ করল। হযরত ইবনে ওমর যদি জানতে পারতেন যে, এটা সেই সদকায় দেওয়া গুচ্ছ, তবে কিছুতেই তা খেতেন না। কিন্তু তিনি বাজার থেকে আনা হয়েছে ভেবে তা ব্যবহার করলেন।

ইবনে মুবারক নিজ সনদে বর্ণনা করেন, একবার খলীফা উমর ফারূক (রা) একটি থলিয়ায় চার শ' দীনার ভরে থলিয়াটি চাকরের হাতে দিয়ে বললেন ঃ এটি আবূ ওবায়দা ইবনে জাররাহের কাছে নিয়ে যাও এবং বল ঃ খলীফার পক্ষ থেকে এই হাদিয়া কবূল করে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করুন। তিনি চাকরকে আরও বলে দিলেন ঃ হাদিয়া পেশ করার পর তুমি কিছুক্ষণ দেরী করবে এবং দেখবে যে, আবূ ওবায়দা কি করেন। চাকর নির্দেশ অনুযায়ী থলিয়াটি হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-র কাছে পেশ করে কিছুক্ষণ দেরী করল। আবূ ওবায়দা (রা) থলিয়া হাতে নিয়ে দোয়া করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ওমরের প্রতি রহম করুন এবং তাকে উত্তম বিনিময় দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ দাসীকে ডেকে বললেন ঃ নাও, এই সাত অমুককে এবং পাঁচ অমুককে দিয়ে এস। এভাবে গোটা চার শ' দীনার তিনি তখনই বণ্টন করে দিলেন।

চাকর ফিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করল। হযরত উমর (রা) এমনিভাবে আরও চার শ' দীনার অপর একটি থলিয়ায় ভর্তি করে চাকরের হাতে দিয়ে বললেন ঃ এটি মুয়ায ইবনে জবলকে দিয়ে এস এবং কিছুক্ষণ দেরী করে লক্ষ্য কর তিনি কি করেন। চাকর নিয়ে গেল। হযরত মুয়ায ইবনে জবল থলিয়া হাতে নিয়ে হযরত উমর (রা)-র জন্য দোয়া করলেন। তিনিও থলিয়া খুলে কালবিলম্ব না করে বণ্টনে বসে গেলেন। তিনি দীনারগুলো অনেক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন গৃহে প্রেরণ করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ব্যাপার দেখে যাচ্ছিলেন। অবশেষে বললেন ঃ আমিও তো মিসকীনই। আমাকেও কিছু দিন না কেন? তখন থলিয়াতে মাত্র দু'টি দীনার অবশিষ্ট ছিল। সেমতে তাই তাঁকে দিয়ে দিলেন। চাকর এই দৃশ্য দেখে ফিরে এল এবং খলীফার কাছে বর্ণনা করল। খলীফা বললেন ঃ এরা সবাই ভাই ভাই। সবার স্বভাব একই রূপ।

হুযায়ফা আদভী বলেন ঃ আমি ইয়ারমুক যুদ্ধে আমার চাচাত ভাইয়ের খোঁজে শহীদদের লাশ দেখার জন্য বের হলাম। সাথে কিছু পানি নিলাম, যাতে তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখলে পান করিয়ে দিতে পারি। তার নিকটে পৌঁছে দেখলাম যে, প্রাণের স্পন্দন এখনও নিঃশেষ হয়নি। আমি বললাম ঃ আপনাকে পানি পান করাব কি? তিনি ইঙ্গিতে 'হ্যাঁ' বললেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কাছে থেকে অন্য একজন শহীদের আহ্ আহ্ শব্দ কানে এল। আমার ভাই বললেন ঃ এই পানি তাকে দিয়ে দাও। আমি তার কাছে পৌঁছে পানি দিতে চাইলে তৃতীয় একজনের কাতরানোর আওয়াজ কানে এল। সে-ও এই তৃতীয়জনকে পানি দিয়ে দিতে বলল। এমনিভাবে একের পর এক করে সাতজন শহীদের সাথে একই ঘটনা সংঘটিত হল। আমি যখন সপ্তম শহীদের কাছে গেলাম, তখন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। সেখান থেকে আমি আমার ভাইয়ের কাছে এসে দেখি তিনিও খতম হয়ে গেছেন।

কিছু আনসারগণের এবং কিছু মুহাজিরগণের মিলিয়ে এই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। অধিকাংশ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। কারণ, যে ধরনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় যদি সেই ধরনের অন্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়, তবে বলে দেওয়া হয় যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃত সত্য এই যে, সবগুলো ঘটনাই আয়াত অবতরণের কারণ।

একটি সন্দেহ নিরসন ঃ সাহাবায়ে কিরামের উপরোক্ত আত্মত্যাগের ঘটনাবলী সম্পর্কে হাদীসদৃষ্টে একটি সন্দেহ দেখা দেয়। তা এই যে, রসূলে করীম (সা) মুসলমানগণকে তাদের সম্পূর্ণ ধনসম্পদ সদকা করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে আছে জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে একটি ডিম্ব পরিমাণ স্বর্ণের টুকরা সদকার জন্য পেশ করলে তিনি তা লোকটির দিকে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ তোমাদের কেউ কেউ তার যথাসর্বস্ব সদকা করার জন্য নিয়ে আসে। এরপর অভাবগ্রস্ত হয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত পাতে।

এসব রেওয়ায়েত থেকেই এই সন্দেহের জওয়াব পাওয়া যায় যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। প্রত্যেক অবস্থার জন্য আলাদা বিধানও হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ধনসম্পদ দান করার নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্য ও উপবাস দেখা দিলে সবর করতে সক্ষম নয় এবং কৃতদানের জন্য আফসোস করে অথবা মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যারা অসম সাহসিক ও দৃঢ়চেতা, সবকিছু ব্যয় করার পর দারিদ্র্য ও উপবাসের কারণে পেরেশান হয় না; বরং সাহসিকতার সাথে সবর করতে সক্ষম, তাদের জন্য সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দেওয়া জায়েয। উদাহরণত এক জিহাদের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর যথাসর্বস্ব চাঁদা হিসাবে পেশ করে দিয়েছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাবলী এরই নযীর। এহেন দৃঢ়চেতা লোকগণ তাঁদের সন্তান-সন্ততিকেও সবর ও দৃঢ়তায় অভ্যস্ত করে রেখেছিলেন। ফলে এতে তাদেরও কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হত না। স্বয়ং সন্তানদের হাতে ধনসম্পদ থাকলে তারাও তাই করত।---(কুরতুবী)

মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে আনসারগণের ত্যাগের বিনিময়ঃ দুনিয়াতে কোন সংঘবদ্ধ মহতী উদ্যোগ একতরফা উদারতা ও আত্মত্যাগ দ্বারা কায়েম থাকতে পারে না, যে পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে এমনি ধরনের ব্যবহার না হয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) যেমন মুসলমানদেরকে পরস্পরে উপঢৌকন আদান-প্রদান করে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেছেন, তেমনি যাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তাকেও উপঢৌকন দাতার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ যদি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, তবে আর্থিক প্রতিদান, নতুবা দোয়ার মাধ্যমেই তার অনুগ্রহের বিনিময় দান কর। অর্বাচীনের ন্যায় কারও অনুগ্রহের বোঝা মাথায় নিতে থাকা ভদ্রতা ও সাধু চরিত্রের পরিপন্থী।

মুহাজিরগণের ব্যাপারে আনসারগণ অপূর্ব আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। নিজেদের গৃহে, দোকানে, কাজ-কারবারে ও শস্যক্ষেত্রে তাঁদেরকে অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন মুহাজিরগণকে সচ্ছলতা দান করলেন তখন তাঁরাও আনসারগণের অনুগ্রহের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করেন নি।

কুরতুবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত ছিলেন এবং মদীনার আনসারগণ বিষয়সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আনসারগণ তাঁদেরকে সব বস্তুই অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দেন এবং বাগানের অর্ধেক ফল বাৎসরিক তাঁদেরকে দিতে থাকেন। হযরত আনাস (রা)-এর জননী উম্মে সুলায়ম নিজের কয়েকটি খর্জুর বৃক্ষ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিয়েছিলেন। তিনি তা উসামা ইবনে যায়দের জননী উম্মে আয়মনকে দান করে দেন।

ইমাম যুহরী বলেনঃ আমাকে হযরত আনাস (রা) জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর যুদ্ধ থেকে বিজয়ীবেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানগণ লাভ করেন। এ সময় সকল মুহাজিরই আনসারগণের দান হিসাব করে তাঁদেরকে প্রত্যর্পণ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জননীর খর্জুর বৃক্ষ উম্মে আয়মনের কাছ থেকে নিয়ে আমার জননীর হাতে প্রত্যর্পণ করেন। উম্মে আয়মনকে এর পরিবর্তে নিজের বাগান থেকে বৃক্ষ দিলেন।

وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ—আনসারগণের আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্‌র পথে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসাবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্‌র কাছে সফলকাম। بخل ও شح শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক। তবে شح শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। যাকাত, ফিতরা, ওশর, কুরবানী ইত্যাদি আল্লাহ্‌র ওয়াজিব হক আদায়ে অথবা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ, অভাবগ্রস্ত পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বান্দার ওয়াজিব হক আদায়ে কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হারাম। যে কৃপণতা মুস্তাহাব বিষয় ও দান খয়রাতের ফযীলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মকরূহ ও নিন্দনীয় এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তা শরীয়তের আইনে কৃপণতা নয়।

কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কোরআন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্য সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে গুণাবলী উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাঁরা কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র হওয়া জান্নাতী হওয়ার আলামতঃ ইমাম আহ্‌মদ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

আমরা একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন ঃ এক্ষণি তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। সেমতে কিছুক্ষণ পরই জনৈক আনসারী আগমন করলেন। তাঁর দাড়ি থেকে ওযূর পানি টপকে পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে জুতা জোড়া ছিল। দ্বিতীয় দিনও এমনি ঘটনা ঘটল এবং সেই ব্যক্তি একই অবস্থায় আগমন করলেন। তৃতীয় দিনও তাই হল এবং এই ব্যক্তি উল্লিখিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। এ দিন রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মজলিস ত্যাগ করলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) এই ব্যক্তির পেছনে লাগলেন (যাতে তাঁর জান্নাতী হওয়ার ভেদ জানতে পারেন)। তিনি আনসারীকে বললেন ঃ পারিবারিক কলহের কারণে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তিন দিন নিজের গৃহে যাব না। আপনি যদি অসুবিধা মনে না করেন, তবে তিন দিন আমাকে নিজের বাড়ীতে থাকতে দিন। আনসারী সানন্দে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর তিন রাত্রি তাঁর বাড়ীতে অতিবাহিত করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আনসারী রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য 'গাত্রোত্থান' করেন না। তবে নিদ্রার জন্য শয্যা গ্রহণের পূর্বে কিছু আল্লাহ্‌র যিকির করেন। এরপর ফজরের নামাযের জন্য উঠেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন ঃ তবে এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁর মুখে ভাল কথা ছাড়া কিছু শুনিনি। এভাবে তিন রাত্রি কেটে গেল। আমার অন্তরে যখন তাঁর আমল সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব বদ্ধমূল হওয়ার উপক্রম হল, তখন আমি তাঁর কাছে আমার আগমনের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দিলাম এবং বললাম ঃ আমার গৃহে কোন কলহ-বিবাদ ছিল না। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখে তিন দিন পর্যন্ত শুনলাম যে, তোমাদের কাছে এখন একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। এরপর তিন দিনই আপনি আসলেন। তাই আমার ইচ্ছা হল যে, আপনার সাথে থেকে দেখব কি আমলের কারণে আপনি এই ফযীলত অর্জন করলেন! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি আপনাকে কোন বড় আমল করতে দেখলাম না। অতএব, কি বিষয়ের দরুন আপনি এই স্তরে উন্নীত হয়েছেন? তিনি বললেন ঃ আপনি যা দেখলেন, এছাড়া আমার কাছে অন্য কোন আমল নেই। আমি একথা শুনে প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ হ্যাঁ, একটি বিষয় আছে। তা এই যে, আমি আমার অন্তরে কোন মুসলমানদের প্রতি জিঘাংসা ও কুধারণা খুঁজে পাই না এবং এমন কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করি না, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কল্যাণ দান করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন ঃ ব্যস, এ গুণটিই আপনাকে এই উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে।

ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ ইমাম নাসায়ীও 'আমলুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ্' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ্।

মুহাজির ও আনসারগণের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমান ঃ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا

مِنْ بَعْدِهِمْ এই আয়াতের অর্থে সাহাবায়ে কিরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাই-কে ফায়-এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করেন নি ; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াক্ফ হিসাবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আমদানী ইসলামী বায়তুলমালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার করতাম, তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম ; যেমন রসূ-লুল্লাহ্ (সা) খায়বরের সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্য কি অবশিষ্ট থাকবে? ---(মালিক, কুরতুবী)

সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসা ও মাহাত্ম্য অন্তরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্যপন্থী হওয়ার পরিচায়ক ঃ এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন----মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বও এ স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কিরামের ঈমানে অগ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈমান পৌঁছানোর মাধ্যম হওয়ার গুণটিকে সম্যক বুঝে এবং সবার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যও এরূপ দোয়া করে ঃ আল্লাহ্ আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইস-লাম কবূল হওয়ার শর্ত হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের মাহাত্ম্য ও ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই হযরত মুসাব ইবনে সা'দ (রা) বলেন ঃ উম্মতের সকল মুসলমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মহব্বত পোষণকারী এক শ্রেণী বাকী

রয়ে গেছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কোন আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণীতে দাখিল হয়ে যাও।

হযরত হুসাইন (রা)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে (তাঁর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল। তিনি পাল্টা প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তবে কি আনসারগণের একজন? সে বলল : না। হযরত হুসাইন (রা) বললেন : এখন তৃতীয় আয়াত اَلَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ বাকী রয়ে গেছে। তুমি যদি হযরত ওসমান গনী (রা) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে চাও, তবে এই তৃতীয় শ্রেণী থেকেও খারিজ হয়ে যাবে।

কুরতুবী বলেন : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা রাখা আমাদের জন্য ওয়াজিব। ইমাম মালেক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের ফায়-এর মালে তাঁর কোন অংশ নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায়-এর মালে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তার ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে কিরামের জন্য ইস্তিগফার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্ জানতেন যে, তাঁদের পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহও হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুধারণা পোষণ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : আমি তোমাদের নবী (সা)-র মুখে শুনেছি---এই উম্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, যতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা না করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বলেন : তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বল : যে তোমাদের মধ্য থেকে অধিক মন্দ তার উপর আল্লাহ্র লানত হোক। বলা বাহুল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না---যে তাঁকে মন্দ বলে সে-ই হবে। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লানতের কারণ।

আওয়াম ইবনে হাওশব বলেন : এই উম্মতের পূর্ববর্তিগণ মানুষকে সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আমি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেন : সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না; করলে মানুষের ধৃষ্টতা বেড়ে যাবে। ---(কুরতুবী)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا
أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾
لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ
نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً
فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا
يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ
بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا
كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَا
قِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

(১১) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলে ঃ তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও; তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিষ্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফিররা কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (১৪) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড

হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধা বিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়। (১৫) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফির হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফির হয়, তখন শয়তান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করি। (১৭) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালিমদের শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি মুনাফিকদেরকে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমুখকে) দেখেন নি? ওরা তাদের (সহধর্মী) কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলে ঃ (অর্থাৎ বলত। কেননা, এই সূরা বনূ নুযায়েরের নির্বাসন ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয়েছে)। আল্লাহ্‌র কসম, (আমরা সর্বাবস্থায় তোমাদের সাথে আছি)। যদি তোমরা (তোমাদের মাতৃভূমি থেকে জোর জবরে বহিষ্কৃত হও, তবে আমরাও) তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। অর্থাৎ তোমাদের সাথে আসার ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করে যে যতই বোঝাক না কেন, আমরা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। (এটা তাদের মিথ্যাবাদিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অতঃপর বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্‌র কসম, যদি কিতাবধারী কাফিররা বহিষ্কৃত হয় তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না। আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে ওরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। যদি (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) তাদেরকে সাহায্যও করে (এবং যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করে) তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর (তাদের পলায়নের পর) কিতাবধারী কাফিররা কোন সাহায্য পাবে না। (অর্থাৎ সাহায্যকারী যারা ছিল, তারা তো পলায়ন করেছে। অন্য কোন সাহায্যকারীও হবে না। সুতরাং অবশ্যই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে। মোটকথা, মুনাফিকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সহধর্মী ভাইদের উপর কোন বিপদ আসতে না দেওয়া। এই উদ্দেশ্য অর্জনে তারা সর্বতোভাবে ব্যর্থ মনোরথ হবে। বাস্তবে তাই হয়েছিল। পরিশেষে যখন বনূ নুযায়ের বহিষ্কৃত হয়, তখন মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগী হয়নি এবং প্রথম যখন তাদেরকে অবরোধ করা হয়, যাতে যুদ্ধের আশংকা ছিল, তখনও তারা কোন সাহায্য করেনি। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে 'যদি বহিষ্কৃত হয়' ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করার এক কারণ অতীত ঘটনাকে উপস্থিত বিদ্য-মান ধরে নেওয়া, যাতে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও তাদের অসহায় থেকে যাওয়া দৃষ্টির সামনে ভাসমান হয়ে যায়। দ্বিতীয় কারণ ভবিষ্যৎ সাহায্যের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের সাহায্য না করার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় তোমরা তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। (অর্থাৎ ঈমান দাবী করে তারা আল্লাহ্‌র ভয় করে বলে প্রকাশ করে; এটা মিথ্যা। নতুবা তারা কুফরী

ছেড়ে দিত। আর তোমাদেরকে ওরা বাস্তবিকই ভয় করে। এই ভয়ের কারণে তারা বনূ নুযায়েরের সাথে সহযোগিতা করতে পারে না)। এটা (অর্থাৎ তোমাদেরকে ভয় করা এবং আল্লাহ্কে ভয় না করা) এ কারণে যে, তারা (কুফরের কারণে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে) এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (ইহুদী ও মুনাফিকরা আলাদা আলাদা-ভাবে তো তোমাদের মুকাবিলা করতেই পারে না) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে। (পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত হোক কিংবা দুর্গ ইত্যাদি দ্বারা। এতে জরুরী হয় না যে, কখনও এরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং মুনাফিকরা কোন সুরক্ষিত স্থান ও দুর্গ থেকে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কারণ, উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন সময় ইহুদী কিংবা মুনাফিকরা আলাদা আলাদা অথবা সংঘবদ্ধভাবে তোমাদের মুকাবিলা করতে আসেও, তবুও তাদের মুকাবিলা সুরক্ষিত দুর্গে অথবা শহর-প্রাচীরের আড়ালে থেকে হবে। সেমতে বনী কুরায়যা ও খায়বরের ইহুদীরা এমনিভাবে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের সাথে সহযোগিতা করেনি এবং প্রকাশ্যে মুসলমানদের মুকাবিলায় আসতে কখনও সাহস করেনি। এতে মুসলমানদের মনোবলও বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, তারা যেন ওদের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশংকা না করে। মুনাফিকদের কোন কোন গোত্র যেমন আউস ও খাযরাজের পারস্পরিক যুদ্ধ দেখে আশংকা করা উচিত নয় যে, তারা মুসলমানদের মুকাবিলায় এমনিভাবে আসতে পারবে। আসল ব্যাপার এই যে) তাদের যুদ্ধ পরস্পরের মধ্যেই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। (মুসলমানদের মুকাবিলায় তারা কিছুই নয়। তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারবে---এরূপ আশংকা করাও ঠিক নয়। কেননা) তুমি তাদেরকে (বাহ্যত) ঐক্যবদ্ধ মনে করবে, অথচ তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন। (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের শত্রুতায় অভিন্ন ঠিকই; কিন্তু তাদের মধ্যেও তো বিশ্বাসগত বিরোধের কারণে বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা রয়েছে। সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে :

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ الخ—অতঃপর এই অনৈক্যের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছেঃ)

এটা (অর্থাৎ অন্তরের অনৈক্য) এ কারণে যে, তারা (ধর্মের ব্যাপারে) এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়। (তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আদর্শ ও লক্ষ্য বিভিন্ন হলে আন্তরিক বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এখানে তাদের অনৈক্যের কারণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। ফলে বে-দীনদের মধ্যেও কোন কোন সময় ঐক্য হতে পারে। অতঃপর বনূ নুযায়ের ও মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা সাহায্যের ওয়াদা করে ধোঁকা দিয়েছে এবং যথাসময়ে সাহায্য করেনি। তাদের সমষ্টির দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে---একটি বনূ নুযায়েরের ও অপরটি মুনাফিকদের। বনূ নুযায়েরের দৃষ্টান্ত এই যে) তারা সেই লোকদের মত, যারা (দুনিয়াতে ও) তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে এবং (পরকালেও) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [এখানে বনূ কায়নুকার ইহুদী সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তাদের ঘটনা এই : বদর যুদ্ধের পর তারা দ্বিতীয় হিজরীতে চুক্তিভঙ্গ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদেশে তারা দুর্গ

থেকে বের হয়ে এলে তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়। এরপর আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাকুতি-মিনতির কারণে মদীনা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার শর্তে তাদের প্রাণ রক্ষা করা হয়। সেমতে তারা সিরিয়ার আমরুয়াতে চলে যায় এবং তাদের ধনসম্পত্তি যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ হিসাবে বন্টন করা হয়।---(যাদুল-মা'আদ) মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এই যে] তারা শয়তানের মত যে, (প্রথমে) মানুষকে কাফির হতে বলে অতঃপর যখন সে কাফির হয়ে যায়, (এবং দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কুফরের শাস্তিতে পতিত হয়) তখন (পরিষ্কার জওয়াব দিয়ে দেয় এবং) বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করি। (দুনিয়াতে এরূপ সম্পর্কচ্ছেদের কাহিনী সূরা আন-ফালে এবং পরকালে সম্পর্কচ্ছেদের কথা একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)। অতঃপর উভয়ের (অর্থাৎ বনূ নুযায়ের ও মুনাফিকদের) শেষ পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। এটাই জালিমদের শাস্তি। (সুতরাং শয়তান যেমন প্রথমে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, এরপর বিপদমুহূর্তে চম্পট দেয়, ফলে উভয়েই বিপদগ্রস্ত হয়, তেমনি মুনাফিকরা প্রথমে বনূ নুযায়েরকে কুপরামর্শ দিয়েছে যে, তোমরা দেশত্যাগ করো না। এরপর যখন বনূ নুযায়ের বিপদের সম্মুখীন হল, তখন মুনাফিকদের পাত্তা পাওয়া গেল না। ফলে বনূ নুযায়ের নির্বাসনের বিপদে এবং মুনাফিকরা অকৃতকার্যতার অপমানে পতিত হল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا الخ—এটা বনূ নুযায়েরের দৃষ্টান্ত। الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلِهِمْ কারা? এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (র) বলেনঃ এরা হচ্ছে বদরের কাফির যোদ্ধা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ এরা ইহুদী বনূ কায়নুকা। উভয়েরই অশুভ পরিণতি তথা নিহত, পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা তখন জনসমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা, বনূ নুযায়েরের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় এবং বনূ কায়নুকার ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশরিক-দের সত্তরজন নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।

অতএব, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-র উক্তি অনুযায়ী فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ বাক্যের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে। এটা পর-কালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত মুজাহিদ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহুদী বনূ কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বনূ কায়নুকার নির্বাসনঃ রসূলে করীম (সা) মদীনায় আগমন করার পর মদীনার পার্শ্ববর্তী সবগুলো ইহুদী গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই

যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের কোন শত্রুকে সাহায্য করবে না। বনূ কায়নুকাও এই শান্তিচুক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত কাজকর্ম শুরু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফিরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনের পর যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা দেখা দেয়, তবে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ভণ্ডুল করে দিতে পারেন। বনূ কায়নুকা নিজেরাই বিশ্বাস-ঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন এবং হযরত হামযা (রা)-র হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হযরত আবূ লুবাবা (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি নিজেও জিহাদে রওয়ানা হলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনূ কায়নুকা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনের দিন অবরুদ্ধ থাকার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন---তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, মুকাবিলা ফলপ্রসূ হবে না। অগত্যা তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বললঃ আমাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) যে সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা তাতেই সম্মত আছি।

রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন; কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক বাদ সাধল। সে চূড়ান্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাল। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করলেনঃ তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধনসম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। এই মীমাংসা অনুযায়ী বনূ কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আমরুয়াত এলাকায় চলে গেল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ধনসম্পত্তি বন্টন করে এক ভাগ বায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বায়তুলমালে গনীমতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমা হল। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫-ই শাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ—এটা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত, যারা বনূ নুযায়েরকে নির্বাসনের আদেশ অমান্য করতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যখন তাদেরকে অবরোধ করে নেয়, তখন কোন মুনাফিক সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কোরআন পাক শয়তানের একটি ঘটনা দ্বারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান মানুষকে কুফর করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে নানা রকম ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিপ্ত হল, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আল্লাহ্ জানেন শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কোরআনে সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছেঃ

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ

وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ

এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের মুকাবিলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু যখন বাস্তবিকই মুকাবিলা শুরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যত কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফির ছিল। শয়তান কেবল তাদেরকে মুকাবিলায় একত্রিত হতে বলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব এই যে, কুফরে অটল থাকতে বলা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলাও কুফর করতে বলারই অনুরূপ।

তফসীরে মাযহারী, কুরতুবী, ইবনে কাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে শয়তানের এই দৃষ্টান্তের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বনী ইসরাঈলের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও যোগীকে শয়তান কর্তৃক বিপথগামী করে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের জনৈক সন্ন্যাসী যোগী সদাসর্বদা উপাসনালয়ে যোগসাধনায় রত থাকত এবং দশ দিন অন্তর মাত্র একবার ইফতার করে রোযা রাখত। সত্তর বছর এমনিভাবে অতি-বাহিত হওয়ার পর অভিশপ্ত শয়তান তার পেছনে লাগে। সে তার সর্বাধিক ধূর্ত ও চালাক অনুচরকে তার কাছে সন্ন্যাসী যোগী বেশে প্রেরণ করে। সে তার কাছে পৌঁছে তার চাইতেও বেশী যোগসাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। এভাবে সন্ন্যাসী তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠে।

অবশেষে কৃত্রিম সন্ন্যাসী আসল সন্ন্যাসীকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিল, যদ্দ্বারা জটিল রোগীও আরোগ্য লাভ করত। এরপর সে অনেক লোককে নিজের প্রভাব দ্বারা রোগগ্রস্ত করে আসল সন্ন্যাসীর কাছে পাঠিয়ে দিত। যখন সন্ন্যাসী রোগীদের উপর দোয়া পাঠ করত, তখন শয়তান তার প্রভাব সরিয়ে নিত। ফলে রোগীরা আরোগ্য লাভ করত। সুদীর্ঘ-কাল পর্যন্ত এই কারবার অব্যাহত রাখার পর সে জনৈক ইসরাঈলী সরদারের পরমা সুন্দরী কন্যার উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করল এবং তাকে রোগগ্রস্ত করে সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিল। শেষ পর্যন্ত সে বালিকাটিকে সন্ন্যাসীর মন্দিরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হল এবং কালক্রমে তাকে বালিকার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত করতেও কামিয়াব হয়ে গেল। এর ফলে বালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেল। অপমানের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শয়তান বালিকাকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। হত্যার পর শয়তান নিজেই ব্যভিচার ও হত্যার কাহিনী ফাঁস করে জনগণকে সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। অতঃপর জনগণ মন্দির বিধ্বস্ত করে সন্ন্যাসীকে শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। তখন শয়তান সন্ন্যাসীর কাছে যেয়ে বলল ঃ এখন তোমার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নেই। তবে তুমি যদি আমাকে সিজদা

কর, তবে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব। সন্ন্যাসী পূর্বেই অনেক পাপ কর্ম করেছিল। ফলে কুফরের পথ অবলম্বন করা তার জন্য মোটেই কঠিন ছিল না। সে শয়তানকে সিজদা করল। তখন শয়তান পরিষ্কার বলে দিল ঃ আমি তোমাকে কুফরীতে লিপ্ত করার জন্যই এসব অপকৌশল অবলম্বন করেছিলাম। এখন আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি না।

তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١٨ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا
اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝١٩ لَا يَسْتَوِيْٓ
اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۭ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ۝٢٠ لَوْ
اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰي جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ
خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُوْنَ ۝٢١ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝٢٢ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ
سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٢٣ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَ
سْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢٤

---

(১৮) **হে মু'মিনগণ!** তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী-কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য। (২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম। (২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর

অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্র ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (২৩) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ্, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! (অবাধ্যদের পরিণাম তোমরা শুনলে, অতএব) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের (অর্থাৎ কিয়ামতের) জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। (অর্থাৎ সৎ কর্ম অর্জনে ব্রতী হওয়া যা পরকালের সম্পদ। সৎ কর্ম অর্জনে যেমন আল্লাহ্কে ভয় করতে বলা হয়েছে, তেমনি মন্দ কাজ ও গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে তোমাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে যে) আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (সুতরাং গোনাহ্ করলে শাস্তির আশংকা আছে। প্রথমে اتَّقُوا اللهَ সৎ কর্ম সম্পর্কে এবং এর ইঙ্গিত হচ্ছে قَدَّمَتْ لِغَدٍ

এবং দ্বিতীয় اتَّقُوا اللهَ পাপ কর্ম সম্পর্কে এবং এর ইঙ্গিত হচ্ছে خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে। (অর্থাৎ তাঁর বিধি বিধান পালন করে না---আদেশের বিপরীত করে এবং নিষেধ মান্য করে না। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন অর্থাৎ তারা বুদ্ধি-বিবেকের এমন শত্রু হয়ে গেছে যে, নিজেদের সত্যিকার স্বার্থ বুঝেওনা এবং তা অর্জনও করে না)। তারাই অবাধ্য। (এবং অবাধ্যদের শাস্তি ভোগ করবে। উপরোল্লিখিত আল্লাহ্ভীতি অবলম্বনকারী ও বিধানাবলী অমান্যকারী দুই দলের মধ্য থেকে একদল জান্নাতের অধিবাসী এবং এক দল জাহান্নামের অধিবাসী) জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়; (বরং) যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম। (পক্ষান্তরে জাহান্নামীরা অকৃতকার্য; যেমন أُولَئِكَ

هُمُ الْفَاسِقُونَ দ্বারা জানা যায়। অতএব তোমাদের জান্নাতের অধিবাসী হওয়া উচিত---জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া উচিত নয়। যে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে এসব উপদেশ শোনানো হয়, তা এমন যে) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের

উপর অবতীর্ণ করতাম (এবং তাতে বোধশক্তি রাখতাম এবং খেয়াল-খুশি অনুসরণের শক্তি না রাখতাম) তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (অর্থাৎ কোরআন এমনি প্রভাবশালী ও ক্রিয়াশীল, কিন্তু মানুষের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি প্রবল হওয়ার কারণে মানুষের সে যোগ্যতা বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সে প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব সৎ কর্ম অর্জন ও পাপ কর্ম বর্জনের মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে দমন করা উচিত, যাতে মানুষ কোরআনী উপদেশাবলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং বিধানাবলী পালনে দৃঢ়তা অর্জিত হয়)। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের (উপকারের) জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে (এবং উপকৃত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাঁর মাহাত্ম্য অন্তরে বদ্ধমূল হওয়ার কারণে বিধানাবলী পালন করা সহজ হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন (যোগ্য) উপাস্য নেই ; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (তওহীদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় তাকীদার্থে পুনশ্চ বলা হচ্ছে ঃ) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন (যোগ্য) উপাস্য নেই ; তিনি বাদশাহ, (সকল দোষ থেকে) পবিত্র, মুক্ত, (অর্থাৎ অতীতেও তাঁর মধ্যে কোন দোষ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও এর সম্ভাবনা নেই। বান্দাদেরকে ভয়ের বিষয় থেকে) নিরাপত্তাদাতা, (বান্দাদেরকে ভয়ের বিষয় থেকে) আশ্রয়দাতা (অর্থাৎ বিপদও আসতে দেন না এবং আগত বিপদও দূর করেন) পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। মানুষ যে শিরক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। তিনিই (সত্য) আল্লাহ্, স্রষ্টা, সঠিক উদ্ভাবক, (অর্থাৎ সবকিছু রহস্য অনুযায়ী তৈরী করেন) রূপ (আকৃতি)-দাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। (এসব নাম উত্তম গুণাবলীর পরিচায়ক)। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই (কথার মাধ্যমে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সুতরাং এমন মহান সত্তার নির্দেশাবলী অবশ্য পালনীয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাশরে শুরু থেকে কিতাবী, কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর সূরার শেষ পর্যন্ত মু'মিনদেরকে হুঁশিয়ারি ও সৎ কর্মপরায়ণতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত প্রথম আয়াতে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে পরকালের চিন্তা ও তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ আছে। বল হয়েছে ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক আয়াতে কিয়ামত বোঝাতে গিয়ে غد শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রথম. সমগ্র ইহকাল পরকালের মুকাবিলায় স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা, পরকাল চিরন্তন, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। মানব-বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না।

এক হাদীসে আছে الدنيا يوم ولنا فيه صوم — সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে আমাদের রোযা আছে। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করা হোক কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্য গুরুত্ববহ নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার বয়সের বছর ও দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় কত যে তুচ্ছ ও নগণ্য, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত; যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়---খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী।

কিয়ামত দুই প্রকার---সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের কিয়ামত। প্রথমোক্ত কিয়ামতের অর্থ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসপ্রাপ্তি। এটা লাখো বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের তুলনায় নিকটবর্তীই। শেষোক্ত কিয়ামত ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছেঃ من مات فقد قامت قيامته অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কায়েম হয়ে যায়। কারণ, কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়ে যায় এবং আযাব ও সওয়াবের নমুনা সামনে এসে যায়। কবরজগৎ যার অপর নাম বরযখ, এটা দুনিয়ার 'ওয়েটিং রুম' (বিশ্রামাগার) সদৃশ। 'ওয়েটিং রুম' ফার্স্ট ক্লাস থেকে [illegible]র্ড ক্লাসের যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিশ্রামাগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধাঁ-ধাঁর রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিরূপণ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ আশংকা করতে থাকে যে, পরের ঘন্টাটি তার জীবদ্দশায় অতিবাহিত নাও হতে পারে, বিশেষত বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলী একে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশী দূরে মনে করো না। কিয়ামত আগামীকালের মত নিকটবর্তী; এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে যাওয়া সম্ভবপর।

আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এতে মানুষকে

চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, নিশ্চিত ও নিকটবর্তী কিয়ামতের জন্য তুমি কি সম্বল প্রেরণ করেছ, তা ভেবে দেখ। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের আসল বাসস্থান হচ্ছে পরকাল। দুনিয়াতে সে মুসাফিরদের ন্যায় বসবাস করে। আসল বাসস্থানে অনন্তকাল অবস্থান করার জন্য এখান থেকেই কিছু সম্বল প্রেরণ করা জরুরী। দুনিয়াতে আসার আসল উদ্দেশ্যই এই যে, এখানে থেকে কিছু উপার্জন করবে, এরপর তা পরকালের দিকে পাঠিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য, এখান থেকে দুনিয়ার আসবাবপত্র, ধনদৌলত ইত্যাদি কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। বরং তা পাঠাবার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। দুনিয়াতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা-পয়সা নিয়ে যাওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি এই যে, এই দেশের ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে অন্য দেশে প্রচলিত মুদ্রা অর্জন করতে হয়। পরকালের ব্যাপারেও একই পদ্ধতি চালু আছে। দুনিয়াতে যা কিছু আল্লাহ্র পথে ও আল্লাহ্র আদেশ পালনে ব্যয় করা হয়, তা আসমানী সরকারের ব্যাংকে (স্টেট ব্যাংক) জমা হয়ে যায়। এরপর সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা তার নামে লিখে দেওয়া হয়। পরকালে পৌঁছার পর দাবী-দাওয়া ব্যতিরেকেই এই সওয়াব তার হস্তগত হয়ে যায়।

مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ — বলে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এরপর اتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তাকীদ করা এবং অপর সম্ভাব্য কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, প্রথমে اتَّقُوا اللّٰهَ বলে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালন করে পরকালের জন্য সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় বার اتَّقُوا اللّٰهَ বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ কর, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সম্বল তাই, যা দৃশ্যত সৎ কর্ম, কিন্তু তা খাঁটিভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না ; বরং নাম-যশ অথবা কোন মানসিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করা হয় অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যত ইবাদত হলেও ধর্মে তার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা। অতএব দ্বিতীয় اتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্য কেবল দৃশ্যত ? সম্বল যথেষ্ট নয় ; বরং তা অচল কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।

فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ — অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই আত্মভোলা হয়ে গেছে। ফলে ভাল-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ—এটা একটা দৃষ্টান্ত অর্থাৎ যদি কোরআন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারী জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হত এবং পাহাড়কে মানুষের ন্যায় জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনা দেওয়া হত, তবে পাহাড়ও কোরআনের মাহাত্ম্যের সামনে নত---বরং ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুশি ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কোরআন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। কেউ কেউ বলেনঃ পাহাড়, বৃক্ষ, ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই এটা কাল্পনিক নয়---বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টান্ত।---(মাযহারী)

পরকালের চিন্তা ও কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আল্লাহ্ তা'আলার কতিপয় পূর্ণত্ববোধক গুণ উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দৃশ্য-অদৃশ্য ও উপস্থিত-অনুপস্থিত বিষয় পুরোপুরি জানেন। اَلْقُدُّوْسُ—এমনি সত্তা, যিনি প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি থেকে পবিত্র। اَلْمُؤْمِنُ—এই শব্দটি মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাসী। আল্লাহ্র জন্য ব্যবহার করলে অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক অর্থাৎ তিনি ঈমানদারগণকে সর্বপ্রকার আযাব ও বিপদ থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন।

اَلْمُهَيْمِنُ---এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ (র) তাই বলেছেন।---(মাযহারী, কামূস)

اَلْجَبَّارُ—প্রতাপশালী মহান। এই শব্দটি جَبْرٌ থেকেও উদ্ভূত হতে পারে, যার অর্থ ভাঙা হাড় ইত্যাদি সংযোগ করা। এ কারণেই ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার পর যে পট্টি বাঁধা হয়, তাকে جَبِيْرَةٌ বলা হয়। অতএব অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও অকেজো বস্তুর সংস্কারক।---(মাযহারী)

اَلْمُتَكَبِّرُ—এটা كِبْرِيَاءٌ ও تَكَبُّرٌ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বড়ত্ব, প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট; তিনি কোন বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য এই শব্দটি দোষ ও গোনাহ্। কারণ, সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্ব দাবী করা মিথ্যা এবং আল্লাহ্র বিশেষ গুণে শরীক হওয়ার দাবী। তাই এটা আল্লাহ্র জন্য পূর্ণত্বের গুণ এবং অন্যের জন্য মিথ্যা দাবী।

الْمُصَوِّرُ—অর্থাৎ রূপ দানকারী। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদ্দরুন এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়েছে। আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল সৃষ্ট বস্তু বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। সৃষ্ট বস্তুর অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি। মানুষের একই শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ ও নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোটি নারী ও পুরুষের চেহারায় এমন স্বাতন্ত্র্য যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে মিলে না---এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই অপার শক্তির কারসাজি। এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। বড়ত্ব যেমন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য বৈধ নয় এবং এটা একমাত্র তাঁরই গুণ, তেমনি চিত্র ও আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্য বৈধ নয়। এটাও আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণে তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করার নামান্তর।

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার উত্তম উত্তম নাম আছে। কোরআন পাকে এসব নামের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সহীহ্ হাদীসসমূহে ৯৯-টি নাম বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক হাদীসে সবগুলোই উল্লিখিত হয়েছে।

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ—এই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়; কেননা, সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও তার অন্তর্নিহিত কারিগরি এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহর্নিশ স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণকীর্তনে মশগুল আছে। সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তসবীহ্ পাঠও হতে পারে। কেননা, সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনুভূতিসম্পন্ন। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবী হচ্ছে স্রষ্টাকে চিনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনি না। এ কারণেই কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ অর্থাৎ তোমরা তাদের তসবীহ্ শোন না, বুঝ না।

সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতসমূহের উপকারিতা ও কল্যাণ : তিরমিযীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি সকালে তিনবার أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পাঠ করার পর সূরা হাশরের هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে। ---(মাযহারী)